রসময়ীর রসিকতা : ঠিক বাজিকরের খেলা

জয়িতা জানা

প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিমল কর বিশিষ্ট ছোটগল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দশটি সরস গল্পের সঙ্কলন গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছিলেন যে—

> "রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলতেন, বাঙালি জাতি হৃদয় মনের সঙ্গে আমোদ করতে জানে না, আমাদের মধ্যে প্রফুল্লতা নাই...।" "আমার ধারণা প্রভাতকুমারের সরস রচনাগুলি যথার্থভাবেই হৃদয় মনের আমোদ। সেগুলির ধর্ম প্রফুল্লতা।"

কৌতুকপূর্ণ হাস্যরসাত্মক গল্প সাহিত্যের ধারায় প্রভাতকুমারের গল্পে যে সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্নিগ্ধ হাসির ছোঁওয়া পাওয়া যায়, তা বাংলা সাহিত্যের কৌতুক রসাত্মক রচনার এক বিরল উপস্থাপনা।

রবীন্দ্রনাথ যখন আপন দীপ্তিময় কিরণছটায় সাহিত্যের মধ্যাকাশে বিরাজমান এবং শরৎচন্দ্রের শরৎ-প্রভা যখন প্রত্যুষের বর্ণময় আলোক ছটায় উদ্ভাসিত—ঠিক তখন একটি সমৃদ্ধময় সময়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিস্ময়কর আগমন (১৮৭৩-১৯৩২)। বাংলা সাহিত্যের এই উজ্জ্বল সময়ে নিজের জন্য সাহিত্যের আঙিনায় স্থান সঙ্কুলান করে নিতে তাঁর এতটুকু অসুবিধা হয়নি। এ সময়ে বেশ কতগুলি উপন্যাস ও অজস্র ছোটগল্প লিখে তিনি অবলীলায় নিজের যথাযোগ্য স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ঠাকুরবাড়ির সংস্পর্শে এসে তিনি বুঝতে পারেন যে, অন্যধারার কথাসাহিত্যই হল তাঁর একমাত্র বিচরণ ক্ষেত্র। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয় 'রমাসুন্দরী' উপন্যাস। তার আগে ১৯০৬-এ 'ষোড়শী' নামক গল্পসংকলনটি প্রকাশিত হয়। মোট চোদ্দটি উপন্যাস এবং প্রায় একশো চোদ্দটি গল্প প্রভাতকুমার রচনা করেছিলেন। সাবলীল পল্লী-নগর জীবনকেন্দ্রিক কাহিনী রচনা করায় বহু সাহিত্য-সমালোচক তাঁকে বিখ্যাত গল্পকার মপাসাঁর সঙ্গে তুলনা করে দেখান। এ বিষয়ে হিন্দী কথাসাহিত্যিক প্রেমচাঁদের সঙ্গে ও কেউ কেউ তাঁর বহু কাহিনীর সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন।

প্রভাতকুমার সুচারুভাবে প্রফুল্ল হাস্যরস সৃষ্টি করতে গিয়ে নির্মল হিউমারধর্মী হাস্যরসাত্মক রচনার জগতে বিচরণ করলেন। যার মধ্যে স্যাটায়ারের নামগন্ধ নেই। পারিবারিক কাহিনীর আবর্তে তাঁর গল্পের সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্নিগ্ধ হাসির ছোঁওয়া পাওয়া যায়। নির্মল আনন্দ ও প্রফুল্লতাই তাঁকে অন্যান্যদের থেকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

বিমল কর বেশকিছুদিন আগে প্রভাতকুমারের যে দশটি সরস গল্পের একটি ক্ষুদ্র সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। সেই গল্পগুলির বিষয়বস্তু ছিল মূলত দাম্পত্য জীবনের নানান কৌতুকময় চিত্রকল্প। 'রসময়ীর রসিকতা' ছিল সেই সংকলনগ্রন্থের অন্যতম নির্বাচিত গল্প। কারণ দাম্পত্য প্রণয়ের এমন রৌদ্র রসাত্মক প্রকাশ নিঃসন্দেহে শুধু সংকলন গ্রন্থটি কেন সমগ্র বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক গল্পের মধ্যে অন্যতম বিরল আবিষ্কার। গল্পের সূচনাতে লেখক ক্ষেত্রমোহনবাবু ও তার স্ত্রী রসময়ী সম্পর্কে বলেছেন—

> "ক্ষেত্রমোহনবাবুর অষ্টাদশবর্ষব্যাপী দম্পতি জীবন স্ত্রীর সহিত যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি

করিতে করিতেই কাটিয়াছে। এমন রণরঙ্গিণী স্ত্রী বঙ্গদেশে প্রায়ই দেখা যায় না। ...'রসময়ী'। —এ নাম যে রাখিয়াছে, বলিহারি তার প্রতিভা! তবে রসও তো অনেকগুলি আছে কিনা—এক্ষেত্রে রৌদ্ররস।"

গল্পের শুরুতে রসময়ীর স্বভাব ও নামকরণ নিয়ে এরকম কটাক্ষ সন্দেহাতীতভাবে লেখকের কৌতুকপ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। এরপর গল্প যত অগ্রসর হয়েছে, লেখকের রসবোধ ততই প্রগাঢ় হয়েছে। এ গল্পের সবচেয়ে বড় ভেল্‌কি মৃত রসময়ীর জীবন্ত চিঠির উপস্থাপনায়। এই উপস্থাপনা গল্পটির মধ্যে ভূতে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসজনিত তর্ককেও উস্‌কে দিয়ে গল্পটির সরল কৌতুককে ধোঁয়াশার ঘনায়মান আবর্তে একটু জটিল করে তুলেছে।

সন্তানহীন এই দম্পতির প্রাত্যহিক কলহ প্রায় প্রতিদিনের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মতোই স্বাভাবিক। কোন কোন দিন গণ্ডগোল কিছু তীব্র হলে রসময়ী রণে-ভঙ্গ দিয়ে গঙ্গার ওপারে বাপেরবাড়ি হালিশহরে গিয়ে ওঠে। কেননা সে জানতো যে কিছুদিন বাদে ক্ষেত্রবাবু সেখানে হাজির হবেন এবং মান-অভিমানের পালা চুকিয়ে সস্ত্রীক বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু সন্তানহীন ক্ষেত্রবাবু বেশ কিছুদিন থেকে সন্তান প্রত্যাশায় দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা ভাবছেন। বিশেষত পাড়া-প্রতিবেশী-আত্মীয়স্বজনও সেরকম সৎ পরামর্শ দিচ্ছেন। তাই এবারে যখন সামান্য কারণে বিবাদ করে রসময়ী ক্ষেত্রমোহনকে দুই দিনের জন্য বাড়ি ছাড়া করল এবং নিজে হালিশহরে বসে থাকল, তখন ক্ষেত্রমোহন তার স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাল না। সে হালিশহরেই গেল না।

দেখতে দেখতে একমাস কেটে গেল। ক্ষেত্রমোহনের কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে রসময়ী চিন্তিত হয়ে পড়ল। কেননা তার বরাবরের আশঙ্কা সুযোগ পেলেই তার স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করে ফেলবে। অবশেষে জানা গেল তার আশঙ্কাই ঠিক। ক্ষেত্রমোহনের বিবাহ স্থির হয়েছে। পাত্রী চুঁচুড়ার হরিশচন্দ্র চাটুয্যের কন্যা। রসময়ীর বিধবা দিদি বিনোদিনী গ্রামের এক বালকের কাছ থেকে কৌশলে বিবাহের সঠিক খবর জোগাড় করে এনেছেন। তারপরে দুই বোনে গাড়ি হাঁকিয়ে সটান চুঁচুড়াতে হানা দিল। রসময়ীর অগ্নিমূর্তি দেখে তারা সকলে ভয়ে অস্থির। রসময়ী চাটুয্যে বাড়ির অন্দরে সকলকে শাসিয়ে চলেছে চিল কণ্ঠে—

"কনেটি গেল কোথা? তাকে একবার বের করো না! চোখ দুটি গেলে দিয়ে যাই! নাকটা কেটে দিয়ে যাই। দাঁতগুলো ভেঙে দিয়ে যাই!"

রসময়ীর ভীষণ রণরঙ্গিণী মূর্তি ও চাটুয্যে বাড়ির ভীত-সন্ত্রস্ত পরিস্থিতি পাঠকমনে এক অনাবিল নির্মল হাসির সঞ্চার করে। এখানে প্রভাতকুমার যেভাবে বাস্তবের সঙ্গে গল্পের সঙ্গতি রক্ষা করে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন, তাতে তাঁর হাস্যকৌতুক সৃষ্টির মুন্সিয়ানাটি প্রকাশিত হয়েছে। চুঁচুড়ার স্থূলস্থুল ঘটনার পর রসময়ী গঙ্গা পেরিয়ে হালিশহর থেকে হুগলিতে এসে স্বামীকেও শাসিয়ে গেছে যে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে সে মজা দেখিয়ে ছাড়বে। আরও জানায় ক্ষেত্রমোহন বুড়ো থুরথুরে না হওয়া পর্যন্ত 'রসিবামনি মরছে না'। কিন্তু শেষপর্যন্ত রসময়ীর এই অহঙ্কারী হুঙ্কার বজায় থাকেনি। এই ঘটনার ছয়মাস পরে রসময়ীর অকাল মৃত্যু ঘটে। তার মৃত্যুর আরও ছয় মাস পরে ক্ষেত্রমোহনের তৃতীয়বার

বিবাহ ঠিক হয় পাশের গ্রামের নায়েব রজনীকান্ত ঘোষালের 'ডাগর' মেয়ের সঙ্গে। বিয়ের আগে ক্ষেত্রমোহনের খুড়ো মশায় উপস্থিত হলেন গ্রাম থেকে।

এরপর মৃত রসময়ীর পর পর তিনটি পত্রাঘাত গল্পের গতিকে অন্য মোড়ে নিয়ে যায়। প্রথম চিঠিটি ক্ষেত্রমোহন পেলো আশীর্বাদের আগের দিন। রসময়ীর মতো অবিকল একইরকম অজস্র ভুল বানানে ও হস্তাক্ষরে লেখা প্রথম চিঠিতে মৃত রসময়ী ক্ষেত্রমোহনকে রীতিমত হুমকি দিয়ে লিখেছে—

"আমি মরিআছি বটে কিন্তু তাই বলিয়া তুমি নিশ্চিতি পাইআছ তাহা মোনেও করিও না। বাড়ির সনমুখে যে বটগাছ আছে তাইতে আমি আজকাল বাস করিতেছি। ...বিবাহ করিও না করিলে তোমার নলাটে অসেস দুগতি নেকা আছে।

রসময়ী।"

বলাবাহুল্য পরলোক থেকে আগত এই পত্র খুড়ো ভাইপোকে যারপরনাই ভীত ও শঙ্কিত করে তুলল। কিন্তু রামনাম যপ করে ও মৃত রসময়ীর পতিপ্রেমের প্রতি আস্থাবান থেকে তারা প্রথম ধাক্কাটি সাময়িকভাবে সামলে উঠলেও বিয়ের পাঁচদিন পূর্বে যখন ক্ষেত্রমোহন মৃত রসময়ীর প্রথম পত্র নিয়ে কয়েকজন উকিল বন্ধুর সঙ্গে শলাপরামর্শে ব্যস্ত, তখনই এল দ্বিতীয়পত্র। যার বয়ান আরও ভয়ানক—

"তুমি মোনে করিআছ আমি তোমায় জে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা ফাকা আওয়াজ। রসি বামনি তেমন মেয়ে নয়। ...এ দুরামোতি পরিত্যাগ করো। নহিলে এক দিন গভীর রাতিরে তুমি যকন ঘুমাইয়া থাকিবে বটগাছ হইতে নামিয়া তোমার বুকে একখানা দসমুনে পাতর চাপাইয়া দিব। ঘুম আর ভাঁগিবে না।"

এই পত্র ক্ষেত্রবাবুর বৈঠকখানায় এতক্ষণ ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে যে প্রবল তর্ক চলছিল, তাকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দিল। কেউ কেউ হস্তাক্ষর পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিল। কথাটি ক্ষেত্রমোহনের মনে ধরল। কিন্তু সেখানেও বিফল হলেন। জানা গেল হস্তাক্ষর মৃত রসময়ীর-ই। তখন খুড়ো মশায় গয়ায় পিণ্ডিদান পর্যন্ত বিবাহ কার্য বন্ধ রাখবার উপদেশ দিলেন। কিন্তু তা-ও রক্ষা হোল না। কিছুদিনের মধ্যেই রসময়ীর তৃতীয় ভয়ঙ্কর পত্রটি এল। তাতে লেখা আছে—

"শুনিলাম না কি গয়ায় আমার পিণ্ডি দিতে যাইতেছ। ভাবিআছ বুঝি পিণ্ডি দিলে আমি উধার হইয়া যাইব। তকন সচন্দে বিবাহ করিবে। গয়ায় যদি যাও তবে চোরের বেশ ধরিয়া রেলগাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তোমার বুকে ছোরা বসাইয়া দিব।"

এবারে ক্ষেত্রমোহন একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বিবাহের আশা পরিত্যাগ করল।

আরও একবার হস্তাক্ষর পরীক্ষা করা হল। কিন্তু ফলাফল পূর্ববৎ। ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে ক্ষেত্রমোহনের চারপাশে খুব আলোড়ন চলতে লাগল। অনেকে সরাসরি ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে চিঠিগুলির সত্যতা যাচাই করে গেল। কিন্তু ক্ষেত্রমোহন নিজে চারপাশের উত্তেজনাতে গা ভাসাতে কোন উৎসাহ পেল না। যথা নিয়মে দিন অতিবাহিত হয়। হঠাৎ একদিন রসাময়ীর ছোট ভাই সুবোধের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ক্ষেত্রমোহন উপযাচক হয়ে হালিশহরে উপস্থিত হয় এবং এই বিপদের দিনে তাদের সহায় হয়। সুবোধ আহত হয়েছিল দোল উৎসব উপলক্ষে বাজি ফাটাতে গিয়ে। ফলে পুলিশ আসে। সাহেব পুলিশ বিস্তারিত

খানা-তল্লাসি করে। সেসময় অকস্মাৎ ক্ষেত্রমোহনের সামনে আবিষ্কৃত হয় রসময়ীর স্বহস্তে লেখা ক্ষেত্রমোহনের নাম-ঠিকানাযুক্ত কতগুলি খাম ও প্রায় গোটা কুড়ি চিঠি। এতদিনে ক্ষেত্রমোহনের কাছে অতীতের পুরো বিষয়টা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। আসলে রসময়ী তার মৃত্যুর পর এইরকম সব পরিস্থিতির কথা কল্পনা করে সেই অনুসারে মৃত্যুর আগেই চিঠিগুলি লিখে রেখে গিয়েছিল। রসময়ীর বিধবা দিদি বিনোদিনী কেবলমাত্র পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই চিঠিগুলি হালিশহর থেকে পোষ্ট করে গেছে।

'রসময়ীর রসিকতা' গল্পের ঘটনার টানাপোড়েনের জটিলতা একটা সামান্য সমাধানের মধ্যে সংগঠিত হয়েছে। পাঠকমনের ভূত-ভবিষ্যতের তীব্র কৌতূহল প্রভাতকুমার প্রশমিত করেছেন সহজ ঘটনার মধ্য দিয়ে। এ যেন ঠিক বাজিকরের খেলা। গল্পটির চরম পরিণতি সম্পর্কে পাঠকের মনে আর কোন খট্‌কা থাকে না। ছোটগল্পের এই তারল্য প্রভাতকুমারের বিরল প্রয়াসকে সার্থক করে তুলেছে। লেখকের এমন বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা সত্যিই অভাবনীয়।

লেখক অত্যন্ত ঘরোয়া-পারিবারিক প্রেক্ষাপটে কাহিনী বয়ন করেছেন। হাসির উপাদান তৈরী করতে গিয়ে গল্পের চরিত্রগুলিকে তিনি মাত্রাতিরিক্ত উদ্ভট ও চূড়ান্ত অসঙ্গত করে তোলেননি। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে রসময়ীর দিদি বিনোদিনী প্রচ্ছন্ন থেকে অতি সূক্ষ্ম রসবোধের দ্বারা এই গল্পের গতি-প্রকৃতিকে নতুন পথে চালিত করেছে। ফলে রসের ক্ষেত্রে বিনোদিনীর ভূমিকাও কম নয়। ক্ষেত্র বিশেষে তার পাঠানো চিঠিগুলিই গল্পের নাটকীয়তাকে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে।

প্রভাতকুমারের কৌতুককাহিনী থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, হাসির গল্পের ভাষা কতখানি সংযত ও সুনির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের আলোচ্য 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে লেখকের এই দক্ষতা সুচারুভাবে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক পরিস্থিতি ও গল্পের ঘটনাগুলিকে সাজিয়েছেন সচেতন শব্দচয়ন, ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে। তাই চাটুয্যেবাড়িতে রসময়ীর অগ্নিবর্ষী ভাষাভঙ্গিমা অসংযত, অবাস্তব হয়ে ওঠেনি। বিশেষ করে অল্প শিক্ষিত রসময়ীর চিঠির শব্দের বানানগুলি নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টি করে। চরিত্রের সঙ্গে মানানসই উদ্ভট বানান পদ্ধতি রসময়ীকে আরও বেশী হাস্যরসে একই সঙ্গে করুণ ও উজ্জ্বল করে তুলেছে।

প্রত্যেক লেখকের একটা নিজস্ব বাচনভঙ্গি থাকে। প্রভাতকুমারের কৌতুকরসাশ্রিত গল্পগুলিতে রয়েছে বৈঠকী মেজাজের অনাবিল প্রফুল্লতা—যা নিঃসন্দেহে সমকালীন হাস্যরসাত্মক গল্পকার ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের চূড়ান্ত উদ্ভট হাসি ও পরশুরামের তীক্ষ্ণ-তীব্র ব্যঙ্গের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র।

'রসময়ীর রসিকতা' ছোটগল্পটি নিরেট হাস্য রসাত্মক গল্প হলেও ক্ষেত্রমোহন ও রসময়ী চরিত্র নির্মাণে লেখক যে অপূর্ব মানবিক দক্ষতা দেখিয়েছেন, তা বাংলা কৌতুক রচনার আঙিনায় সার্থক বলে মনে হয়।